শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে
নমনীয় বর্ষপঞ্জি : বাস্তবতা ও প্রত্যাশা

Campaign for Popular Education (CAMPE)

গণসাক্ষরতা অভিযান
Campaign for Popular Education (CAMPE)

শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

নমনীয় বর্ষপঞ্জি : বাস্তবতা ও প্রত্যাশা

Campaign for Popular Education (CAMPE)

গণসাক্ষরতা অভিযান
Campaign for Popular Education (CAMPE)

শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

নমনীয় বর্ষপঞ্জি : বাস্তবতা ও প্রত্যাশা

গবেষণা

অধ্যাপক মুহাম্মদ নাজমুল হক

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পর্যালোচনা

চৌধুরি মুফাদ আহমেদ

অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদনা

রাশেদা কে. চৌধূরী

গণসাক্ষরতা অভিযান

প্রকাশনায়
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা – ১২০৭
ফোন: ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২
ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২
ই–মেইল: info@campebd.org
ওয়েবসাইট: www.campebd.org

প্রকাশকাল
মার্চ ২০১৩

ISBN: 978-984-33-6291-9

মুদ্রণ
আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭, বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫।
ফোন: ০১৯৩১-১১৮২৪৩
ই-মেইল: agami.printers@gmail.com

সহযোগিতায়
সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো–অপারেশন (এসডিসি)

মুখবন্ধ

শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নমনীয় বর্ষপঞ্জি প্রণয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই করার বিষয়টিকে গণসাক্ষরতা অভিযান একটি প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী উদ্যোগ বলে বিবেচনা করে। বাংলাদেশের বেশ কিছু অঞ্চলে সারা বছর যাতায়াত ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রা একই রকম থাকে না। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কর্ম ও পেশার ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো সময় এসব এলাকায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধা সৃষ্টি হয়। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বিবিধ প্রাকৃতিক পরিবর্তন যেমন, উপকূলীয় অঞ্চলের জোয়ার-ভাটা, চর ও হাওর অঞ্চলে বর্ষণ ও শুষ্ক মৌসুমে শিশুদের চলাচলে সমস্যা, হাট-বাজার ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিসহ কৃষিকর্মের চাহিদা ও জীবন জীবিকার ভিন্নতার কারণেও বিদ্যালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম ব্যাহত হয়। স্থানীয় পর্যায়ের এসব বাস্তব অবস্থার কথা বিবেচনা করে সরকার অঞ্চলভেদে কিছু কিছু বিদ্যালয়ের জন্য নমনীয় বর্ষপঞ্জি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। এ লক্ষ্যে ১৭ এপ্রিল ২০০৮ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক **"নমনীয় বিদ্যালয় বর্ষপঞ্জি"** (Flexible School Calendar) বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। সরকারের এ উদ্যোগে প্রশাসনিক সহায়তা ও অবহিতকরণ কার্যক্রমকে জোরদার করে কীভাবে এসব অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া যায় সে সংক্রান্ত ভাবনা এবং অংশীজনদের মতামত সংকলন ও তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে এই জরিপ কাজটি পরিচালিত হয়েছে।

মাঠভিত্তিক এই গবেষণা কাজে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সরকারি–বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই উপর্যুক্ত বিষয়ের উন্নয়ন সাধনকল্পে মূল্যবান মতামত/পরামর্শ প্রদান করেন। এই গবেষণা কাজে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর অধ্যাপক মুহাম্মদ নাজমুল হক মুখ্য গবেষক হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এ জন্য অভিযান-এর পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। জনাব চৌধূরি মুফাদ আহমেদ এবং অধ্যাপক শফি আহমেদ গবেষণা প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। এছাড়াও উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণে গবেষককে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন জেবুন নাহার, কে. এম. এনামুল হক এবং মির্জা কামরুন নাহার। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। এ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিয়ে সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন (এসডিসি) আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

আমাদের এ প্রকাশনাটি যদি সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে এবং বাংলাদেশের শিক্ষার অগ্রযাত্রায়, বিশেষ করে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মানসম্মত শিক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখতে পারে, তাহলে আমাদের এ প্রয়াস সফল হবে বলে আমরা মনে করি।

রাশেদা কে. চৌধূরী
নির্বাহী পরিচালক

ঢাকা, ২০ মার্চ ২০১৩

সূচিপত্র

নমনীয় বর্ষপঞ্জি প্রণয়নের পটভূমি	০১
গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য	০২
গবেষণার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	০৩
আলোচকদের মতামত বিশ্লেষণ	০৪
সমস্যা মোকাবেলায় নমনীয় বর্ষপঞ্জি	১০
সুপারিশমালা	১২
পরিশিষ্ট	১৪

নমনীয় বর্ষপঞ্জি প্রণয়নের পটভূমি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষা একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হলেও সবার জন্য এই অধিকার অদ্যাবধি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী প্রায় ১২ লক্ষ শিশু এখনও বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি। যারা ভর্তি হয়েছে তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ নানাবিধ কারণে শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত উপস্থিত থাকছে না বা থাকতে পারছে না। ফলে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরও সকল শিশু একই ভাবে একই মানের শিক্ষা অর্জন করছে না। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে। সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে আনার জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নানাবিধ উদ্যোগসহ শিক্ষানীতি ও শিক্ষা অধিকার আইন প্রণয়ন করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষায় অভিগম্যতা এবং শিক্ষার মান উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।

পরিবেশগত দিক থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং এ অবস্থায় বিশেষ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কিছু কিছু এলাকা রয়েছে যেখানে সারা বছর যাতায়াত ব্যবস্থা এবং জীবন যাত্রার ধরন একই রকম থাকে না। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন ও জীবিকায় ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। যাতায়াত ব্যবস্থায় সমস্যা সৃষ্টি হয়। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া এবং শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক পরিবর্তন যেমন, ভাটি অঞ্চলে জোয়ার-ভাটা, বন্যা ও প্লাবন মৌসুমে শিশুদের চলাচলে সমস্যা, উপকূলবর্তী এলাকায় মাছের রেণু পোনা ধরা এবং ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সময় শিশুদের বিদ্যালয়ে না যাওয়া, নদী অববাহিকায় মাছ ধরা মৌসুমে এবং কৃষি অধ্যুষিত এলাকায় ফসল কাটার সময়ে শিশুশ্রমের কারণে শিশুরা বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে উপস্থিত হয় না। এছাড়াও দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে জুমচাষ মৌসুমে, হাট-বাজারের দিন এবং বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির কারণেও বিদ্যালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম ব্যাহত হয়। ফলে শিক্ষার্থী-শিক্ষক সংযোগ সময় (Contact Hour) কমে যায়, শিশুরা বঞ্চিত হয় মানসম্মত শিক্ষা থেকে।

উপর্যুক্ত সমস্যা বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ২০০৮ সালে স্থানীয় চাহিদার আলোকে বিদ্যালয়ের জন্য নমনীয় বর্ষপঞ্জি প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে।

জলবায়ু ও আঞ্চলিক পরিবেশ, স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, জনগণের জীবন-জীবিকা ও কৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণি পাঠদানের বিদ্যমান সময়সূচি এবং বার্ষিক অবকাশকাল পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

বিদ্যমান শ্রেণিপাঠদান সময়সীমা			পুনর্নির্ধারণযোগ্য শ্রেণি পাঠদান সময়সীমা		
বছরের অংশ	মহানগর	জেলাসদর/পৌরসভা/ উপজেলা/থানা	বছরের অংশ	প্লট	যে কোন এলাকা
নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি	৮:০০-২:৪০	৯:৩০-৪:১৫	নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি (শীতকাল)	১	৭:৩০-২:১৫
				২	৮:০০-২:৪৫
				৩	৮:৩০-৩:১৫
				৪	৯;০০-৩:৪৫
মার্চ-অক্টোবর	৭:৩০-২:১৫	৯:৩০-৪:১৫	মার্চ-জুন (গ্রীষ্মকাল)	১	৭:০০-১:৪৫
				২	৭:৩০-২:১৫
				৩	৮:০০-২:৪৫
				৪	৮:৩০-৩:১৫
			জুলাই অক্টোবর (বর্ষাকাল)	১	৭:৩০-২:১৫
				২	৮:০০-২:৪৫
				৩	৮:৩০-৩:১৫
				৪	৯;০০-৩:৪৫

নমনীয় বর্ষপঞ্জি বিষয়ক সরকারের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর বেশ কয়েক বছর পার হয়ে গেছে। সরকার প্রণীত এ নীতিমালা কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, এর ফলে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের লেখাপড়ায় কী প্রভাব পড়ছে, এ নীতিমালার সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করাসহ প্রতিকারের কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া এখন সময়ের দাবি।

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য

- সরকারের সার্বিক প্রচেষ্টার পরও কী কী কারণে শিশুদের বিদ্যালয়ে গমন এবং নিয়মিত উপস্থিতি ব্যাহত হয় তা নিরূপণ করা;
- বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থাভেদে কী কী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা নিরূপণ করা;
- শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ঋতু পরিবর্তন, কৃষি ব্যবস্থা এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রমের আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধান করা;
- চিহ্নিত সমস্যার কারণ অনুসন্ধান এবং তা প্রতিকারে ও শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নে নমনীয় বর্ষপঞ্জির গুরুত্ব বিবেচনা ও পর্যালোচনা করা।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

এই গবেষণা সম্পাদনের পূর্বে বেশ কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় রাখা হয়েছিল। যেমন, বিদ্যালয়ের জন্য নমনীয় বর্ষপঞ্জির জারিকৃত প্রজ্ঞাপন সরকার যথাযথভাবে বিস্তরণ করেছিল কিনা এবং এই প্রজ্ঞাপনের ব্যাপারে সরকার কতটা নিয়মনিষ্ঠ ও আন্তরিক ছিল তা যাচাই করা। এসব বিষয় অনুসন্ধানের সময় গবেষক দলকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। কারণ, কাগজেপত্রে ২০০৮ সালের দিকে এই নমনীয় বর্ষপঞ্জি বাস্তবায়নের পক্ষে শিক্ষা কর্মকর্তাগণের কাছ থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য মতামত পাওয়া গেলেও এ ব্যাপারে কারো কাছ থেকে তেমন কোনো সাড়া বা উদ্যোগ সংক্রান্ত কোনো দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ফলে, অনেক খোঁজাখুঁজির পর কেবল একটি উপজেলায় (সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায়) এই বিষয়ে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির কিছু উদ্যোগ গ্রহণের নমুনা পাওয়া যায়।

২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে মাঠ পর্যায়ে এই মতামত জরিপ চালানো হয়। গবেষক দল প্রথমে চেষ্টা চালিয়েছিল ঢাকা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে বর্ষপঞ্জি পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণের কোনো চিত্র বা নমুনা পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু তার কোনো সঠিক চিত্র না পাওয়ায় পরবর্তীকালে উদ্দেশ্যমূলকভাবে চারটি জেলা থেকে চারটি উপজেলা নির্বাচন করা হয়। এই উপজেলাগুলো হলো সুনামগঞ্জ সদর, ভোলার তজুমদ্দিন, বরিশাল সদর এবং গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলা। এই সবগুলো অঞ্চলই অত্যন্ত দুর্গম এবং নমনীয় বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করার জন্য অত্যন্ত উপযোগী স্থান। যাই হোক, অভিযান-এর উদ্যোগে স্থানীয় সহযোগী সংগঠনের সহায়তায় স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিক্ষা কর্মকর্তা, স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

নমনীয় বর্ষপঞ্জি এবং এ বিষয়ে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের মতামত সংগ্রহ করার জন্য প্রধানত উন্মুক্ত আলোচনা, তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল। আলোচনার পূর্বে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পক্ষ থেকে একটি ধারণাপত্র এবং গবেষকের অনুসন্ধানের বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়, যাতে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ নমনীয় বর্ষপঞ্জির বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারেন এবং এই বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত দিতে পারেন। মুক্ত আলোচনায় বক্তারা নিজ নিজ এলাকার শিশু শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোকপাত করেন এবং নমনীয় বর্ষপঞ্জি প্রণয়নে সেগুলো কীভাবে বিবেচনায় নেওয়া যায় সে বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। মুক্ত আলোচনার পর বিশেষ দল যেমন, শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষক, এলাকাবাসী এবং অভিভাবকদের নিয়ে পৃথকভাবে ফোকাস দল আলোচনা পরিচালনা করা হয়। মুক্ত আলোচনায় প্রায় ৩০-৪০ জন ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রতিটি ফোকাস দল আলোচনায় ১০-১২ জন করে সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এতদ্‌সঙ্গে কয়েকজন প্রশাসনিক এবং শিক্ষা প্রশাসন কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

মাঠ পর্যায়ের উপরোক্ত আলোচনাগুলোতে যে সব বিষয়ে প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছিল তার একটি তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাগণ এই বিষয়ে অবগত আছেন কিনা তা জানার চেষ্টা;

২. তাদের এলাকায় সারা বছরের শিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা জানা;

৩. দুর্গম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকাবাসী স্কুলের সময়সূচি পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন বোধ করেন কিনা;

৪. তারা সময়সূচি পরিবর্তনে কোনো উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা, নিলে তা কী ধরনের;

৫. বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য নমনীয় বর্ষপঞ্জি বিষয়ে এলাকাবাসীদের মতামত;

৬. নমনীয় সময়সূচি প্রবর্তন করলে শিশুদের জন্য কী কী সুবিধা ও সমস্যা হতে পারে;

৭. শিক্ষার্থীরা এই সময় পরিবর্তনকে কীভাবে গ্রহণ করবে সে বিষয়ে আলোচকদের মতামত;

৮. ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে স্কুলের সময়সূচির পরিবর্তনকে কীভাবে খাপ খাওয়ানো যায়;

৯. এই পরিবর্তনের জন্য সরকারের তরফ থেকে কোনো সমস্যা হবে কিনা সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ;

১০. সর্বোপরি আলোচকবৃন্দ ব্যক্তিগতভাবে এই পরিবর্তনকে কেমনভাবে গ্রহণ করবেন সেই বিষয়ে ধারণা অর্জন।

চারটি উপজেলায় মুক্ত আলোচনা, ফোকাস দল আলোচনা এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর সংগৃহীত তথ্যকে কয়েকটি ভাগে বিশ্লেষণ করা হয়।

আলোচকবৃন্দের মতামত বিশ্লেষণ

চারটি নির্বাচিত উপজেলায় বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের সর্বত্র একই ধরনের ভৌত বা প্রাকৃতিক পরিবেশ বিরাজ করে না। বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র দেশ। কিন্তু তার মধ্যেও নানা ধরনের বৈচিত্র্য বিদ্যমান। ধর্মবিশ্বাস, পেশাগত ভিন্নতা, ভৌগোলিক অবস্থার পার্থক্য, অর্থনৈতিক সুবিধা ও সমস্যা এবং অঞ্চলভেদে এ দেশের মানুষ বিভিন্ন রকমের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। তাদের এলাকার জীবনযাত্রার অবস্থা অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থায়ও কিছু তারতম্য ঘটে থাকে, যদিও শিক্ষা কর্মকর্তা বা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই বিষয়ে আগে কখনো এমন তারতম্য নিয়ে চিন্তা করেননি।

সমগ্র বাংলাদেশ একটি প্রশাসনিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়। দেশব্যাপী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই শিক্ষাক্রম, সময়-ক্রম, ছুটির তালিকা এমনকি ব্যবস্থাপনাও একইভাবে অনুসরণ করা হয়। ফলে জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, ঋতু পরিবর্তন, সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানভেদে স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কোনো এলাকায় যখন বন্যার পানি সবকিছু তলিয়ে দেয়, অপর এলাকায় তখন খরা; যখন কোথাও ফসল কাটার সময় তখন অপর এলাকায় নির্ঝঞ্ঝাট অবসর। এরূপ অবস্থায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চালু বা স্থগিত রাখা অথবা পরীক্ষা

নেওয়া-না নেওয়ার বিষয়গুলো বেশ জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে থাকে। অর্থাৎ, কখনো ক্লাস চলার উপযুক্ত সময়ে বাধ্য হয়েই স্কুল বন্ধ রাখতে হয়। যদি আবহাওয়া ও ভূপ্রকৃতির কথা বিবেচনা না করে দেশব্যাপী একই রুটিনে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা চলে তা হলে বছরের ২৯০ কর্ম দিবসের মধ্য থেকে আরো অনেকগুলো দিবস ঝরে গিয়ে মোট সংযোগ সময় (Contact Hour) কমে যেতে পারে, যা শিক্ষার গুণগত মানকে প্রভাবিত করে।

বিভিন্ন আলোচনা থেকে এলাকার যে আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্য উঠে আসে, তা প্রকৃত অর্থেই একটি নতুন দৃষ্টি উন্মোচন করে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক চালচিত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, শিক্ষাবর্ষের পুরো সময় জুড়ে সারা দেশের অবস্থা একই রকম থাকে না বরং অঞ্চল ও প্রাকৃতিক অবস্থাভেদে শিক্ষা কার্যক্রমের তারতম্য হয়। সে কারণেই দেশের ভূপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এবং শিক্ষা কর্মকর্তা ও এলাকাবাসীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দেশের দুর্গম ও বিভিন্ন সময়ে কর্মব্যস্ত এলাকাগুলোর একটি চিত্র তুলে আনা হয়। নিচে এসব এলাকা ও তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। গবেষণা পর্যালোচনা থেকে ভৌগোলিক এবং জীবন-জীবিকা ও ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন মৌসুম ও অবস্থাসম্পন্ন এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে বিবিধ কারণে শিক্ষা কার্যক্রমে তারতম্য ঘটে। এই এলাকাগুলো হলো:

- চর, হাওরসহ প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিকভাবে দুর্গম এলাকা
- চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া-আক্রান্ত এলাকা
- খরা ও বন্যাপ্রবণ এলাকা
- জোয়ার-ভাটাপ্রবণ উপকূলীয় এলাকা
- ফসল সংগ্রহ মৌসুমে ব্যস্ত এলাকা
- ঈদ ও পূজা-পার্বণ পালন মৌসুমে ব্যস্ত এলাকা

চর, হাওরসহ প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিকভাবে দুর্গম এলাকা

বাংলাদেশেও ভৌগোলিকভাবে অনেক দুর্গম এলাকা রয়েছে, যেমন - পাহাড়ি অঞ্চল, চরাঞ্চল, বনাঞ্চল ইত্যাদি। এসব অঞ্চলের অধিবাসীরা শহুরে লোকালয় থেকে বহু দূরে - কখনো ২০/২৫ কিলোমিটার বা তার চেয়েও বেশি দূরে অবস্থান করে। এসব এলাকার অধিবাসীদের অধিকাংশই হতদরিদ্র এবং শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। তাদের জীবনযাত্রা প্রধানত কৃষি অথবা মৎস্যচাষ বা শিকার নির্ভর। এসব দুর্গম এলাকায় কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে দু-একটি বিদ্যালয় পাওয়া যায় এবং সেগুলোতে শিক্ষক সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কম থাকে। বিদ্যালয়গুলো দূরবর্তী হওয়ার কারণে সেখানে শিশুদের উপস্থিতি কম থাকে। তাছাড়া দূরত্বের কারণে কোনো শিক্ষা কর্মকর্তাও সেখানে খুব একটা পরিদর্শনে যান না। ফলে তাদের শিক্ষার মানও নিম্নগামী হয়ে পড়ে।

চর, হাওর ও ভাটি অঞ্চলগুলোর সমস্যা হলো এখানে বর্ষা মৌসুমে বাড়ি-ঘর ও বিদ্যালয় প্লাবিত হয়। ফলে শিশুরা ঐ সময় স্কুলে যেতে পারে না। যখন আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে দেশের অন্যত্র নিয়মিত ক্লাস হয় তখন এই এলাকায় ভরা বর্ষার কারণে স্কুলগুলো বন্ধ থাকে। হাওর অঞ্চলে ঝড়ো হাওয়ার (আঞ্চলিক ভাষায় 'তাফাল') জন্য চলাচল ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। এমনকি পানি শুকিয়ে যাওয়ার পরও বহুদিন পর্যন্ত রাস্তাঘাট যাতায়াতের অযোগ্য থাকার ফলে শিশু ও শিক্ষকরা স্কুলে যেতে পারে না। ফলে একটা দীর্ঘ সময় শিশুরা লেখাপড়া থেকে দূরে থাকে এবং শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ে। শীত মৌসুমে চরাঞ্চলে বিভিন্ন ফসলের আবাদ চলতে থাকে এবং ঐ সময় চরে শ্রমিকের অভাবের কারণে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা-মাকে চাষাবাদে সাহায্য করে। ফলে ঐ সময়ও তারা বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেয়।

সুতরাং এই দুটি সময়ের কথা বিবেচনা করে চরাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলো যদি ছুটির তালিকায় পরিবর্তন এনে বছরের অন্যান্য বন্ধের সময় ক্লাস চালিয়ে যায় এবং শীত ও বর্ষা মৌসুমে স্কুল বন্ধ রাখে তাহলে সারা বছরের কর্ম দিবসের কোনো ক্ষতি না করে শিশুদের শিক্ষার মান রক্ষা করা যায়। এলাকাবাসী ও শিক্ষা কর্মকর্তাগণের আলোচনা থেকে আরো জানা যায় যে, ভাটি অঞ্চলে প্রতি মাসে অন্তত দুই দিন পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সময় জোয়ারের পানি এতটাই উঁচু হয় যে ঐ সময় নিম্নাঞ্চলের কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় পানিতে ডুবে যায়। ফলে বছরের মধ্যে এমনিতেই ঐসব বিদ্যালয়ে ২৪ দিন ক্লাস বন্ধ থাকে। কিন্তু সরকারি ছুটির তালিকায় এই সমস্যার হিসাব না থাকায় অনির্ধারিতভাবে এসব বিদ্যালয়ে তিন সপ্তাহের অধিক সময় ক্লাস বন্ধ থাকে।

দুর্গম এলাকার বিদ্যালয়গুলো প্রধানত ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সমস্যার কারণে দেশের অন্যান্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে সাধারণ ছুটি ভোগ করার পাশাপাশি অতিরিক্ত কিছু দিন স্কুল বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের বার্ষিক ক্লাসের সংখ্যা কমে যায়। দুর্গম অঞ্চলের শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে তারা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা গেছে। এই তালিকায় রয়েছে:

১. দুর্গম এলাকার কারণে বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক নিকটবর্তী শহরে অবস্থান করেন এবং কাজের সময় ঠিকমতো স্কুলে উপস্থিত হন না অথবা হতে পারেন না।

২. জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে বন্যা ও প্রতি মাসের জোয়ারের সময় অতিরিক্ত পানির কারণে শিক্ষক ও শিশুরা ক্লাসে উপস্থিত হতে পারে না।

৩. চর ও দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে ফসল কাটার মৌসুমে স্কুল খোলা থাকা সত্ত্বেও শিশুরা ক্লাসে উপস্থিত থাকে না। ফলে তাদের পড়ালেখায় ব্যাপক ক্ষতি হয়।

৪. ভাটি অঞ্চল বিশেষ করে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ চিংড়িপোনা সংগ্রহের কাজে স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। ফলে চিংড়িপোনা সংগ্রহের সময় স্কুল বন্ধ রেখে অন্য সময় তা পুষিয়ে নেওয়া যায়।

চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া-আক্রান্ত এলাকা

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে, যেমন: রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী এলাকায় শীত ও গ্রীষ্মের সময় আবহাওয়া এতটাই তীব্র থাকে যে ঐ সময় শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা অনেকটাই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। এর ফলে শীত ও গ্রীষ্মকালে শিশুদের বিদ্যালয়ে আসার আগ্রহ কমে যায়। তাছাড়া ফসল কাটার মৌসুমে শিশুরা মাঠে বাবা-মাকে সাহায্য করে এবং স্কুলে আসে না। এসব এলাকায় এমন কি শহর এলাকাতেও শিশুরা সকালে স্কুলে আসা থেকে বিরত থাকে। সুতরাং তীব্র শীত ও দাবদাহের সময় যদি স্কুল বন্ধ দিয়ে তার সমসংখ্যক দিন নৈমিত্তিক ছুটির সঙ্গে অদলবদল করা যায়, তবে সারা বছরে শিশুদের লেখাপড়ার কোনো রকম ক্ষতি হয় না। শিক্ষকরা মনে করেন যে, রোজার সময় ছুটি কিছু কমিয়ে ঈদের পূর্বে কয়েক দিন এবং ঈদের পর কিছু বেশি ছুটি দিলে শিশুরা ভালোভাবে বেড়াতে পারে এবং এর দ্বারা শুধু ছুটির দিনগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। গরমের সময় ভোরে স্কুল শুরু করা যায় এবং দুপুরের পরপরই তা শেষ করে দিলে শিক্ষক ও শিশুদের কষ্ট কিছুটা কম হতে পারে। উত্তরাঞ্চলে প্রধান অসুবিধা হলো:

১. রংপুর অঞ্চলের গাইবান্ধা জেলার কিছু এলাকা আবহাওয়ার দিক থেকে একটি চরমভাবাপন্ন। এখানে প্রায় প্রতি বছরেই জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত সাধারণত প্রবল বন্যার প্রকোপ থাকে। ফলে শিশুরা তখন ক্লাসে উপস্থিত হতে পারে না।

২. এখানকার শিশুরা হতদরিদ্র বলে ফসল তোলার মৌসুমে তারা মাঠে কাজ করে। তাই ক্লাসে উপস্থিত হতে পারে না। এই মৌসুমে স্কুল খোলা না রেখে বন্ধ রাখা যেতে পারে এবং অন্য সময় স্কুল খোলা রেখে তা পুষিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

৩. উত্তরবঙ্গের কিছু এলাকা নদীভাঙন এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। তাই নদীভাঙনের সময় শিশুরা স্কুলে আসে না। তখন তাদের লেখাপড়ার ব্যাপক ক্ষতি হয়।

৪. এই অঞ্চলের অনেক শিক্ষক কর্ম এলাকা থেকে দূরে বাস করেন। তাই সকালে অনেক পথ পারি দিয়ে আসতে হয় বলে তারা দেরি করে স্কুলে উপস্থিত হন।

খরা ও বন্যাপ্রবণ এলাকা

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, নিম্ন-মধ্যাঞ্চল, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জের হাওর এলাকা প্রধানত খরা ও বন্যাপ্রবণ অঞ্চল বলে চিহ্নিত। এসব নিম্নাঞ্চলে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় প্লাবিত হয় এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত সেখানে পানি জমা থাকে। কোনো কোনো স্থানে স্কুল প্লাবিত না হলেও আশপাশের বাড়িঘর ডুবে যাওয়ার কারণে অধিবাসীরা স্কুলে এসে আশ্রয় নেয়। তাই সে সময় স্কুলের লেখাপড়া বন্ধ থাকে। যতদিন এলাকায় পানি ও কাদা থাকে ততদিন পর্যন্ত শিশুরা স্কুলে আসে না। হাওর অঞ্চলের আর একটি বড় অসুবিধা হলো, বর্ষাকালে এই এলাকার প্রতিটি পাড়া এমনকি প্রতিটি বাড়ি এক একটি দ্বীপে পরিণত হয় এবং তার আশেপাশে এতটাই পানি ও বিশাল

ঢেউ থাকে যে তখন ছোট শিশুরা নৌকায় করে স্কুলে যেতে ভয় পায়। তাই ঐ সময় তাদের স্কুল বন্ধ থাকে। অথচ এই বন্ধ স্কুলের নিয়মিত বন্ধের বাইরে হওয়ায় শিশুদের সংযোগ সময় (Contact Hour) কমে যায় এবং তারা শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের শিক্ষার মান হয় নিম্নগামী। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আরো কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো:

১. শিক্ষকগণ এই বন্যা ও খরাপ্রবণ এলাকাতে অবস্থান করেন না। তারা সর্বদাই নিকটবর্তী শহরে অবস্থান করেন এবং স্কুলের দিন হাওর পারি দিয়ে কর্মস্থলে আসেন।

২. দূরে অবস্থান করার কারণে প্রতিদিনই তাদের স্কুলে আসতে বিলম্ব ঘটে। আবার স্কুলের সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই তারা নিজেদের আবাস স্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।

৩. প্রতিদিন যাতায়াত করার কারণে নিজেদের খরচের পরিমাণ বেড়ে যায়। তাই তারা কখনো বদলি শিক্ষক নিয়োগ করে নিজেদের চাকরি রক্ষা করেন।

৪. এই এলাকায় শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে বিদ্যালয়গুলো অনেক দূরে অবস্থিত বলে বন্যার সময় শিশুদের নৌকায় যাতায়াত করতে হয়। তাই ভরা বন্যার মৌসুমে শিশুদের উপস্থিতির হার কমে যায়।

জোয়ার-ভাটাপ্রবণ উপকূলীয় এলাকা

দেশের নিম্নাঞ্চল বা উপকূলীয় অঞ্চলকে ভাটি অঞ্চল বলা হয়। এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হলো এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা সার্বিকভাবে পানি ও প্রকৃতি-নির্ভর। বর্ষাকালে এই অঞ্চল বানের পানিতে প্রায় তলিয়ে যায়। আবার বর্ষা না থাকলেও কোনো কোনো অঞ্চলের বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সময় ভরাকাটালের কারণে জোয়ারের পানি প্রায় ৭/৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অবস্থান করে। এই জোয়ারের সময় পথঘাট এমন কি বিদ্যালয় ভবনও জোয়ারে আক্রান্ত হয়। তখন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সকলেই অঘোষিত ছুটি কাটাতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ প্রতি মাসে দুই দিন এবং বছরে অন্তত ২০-২৪ দিন পর্যন্ত স্কুলের লেখাপড়ায় ছেদ পড়ে। সরকারের শিক্ষা কার্যক্রমে এই বাধ্যতামূলক ছুটির কোনো বিধান না থাকায় মোট কর্ম দিবসের ২৯০ দিন থেকে এই সময় বাদ পড়ে যায়। ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালি, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি বা উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চলে এই সমস্যা বেশি দেখা দেয়।

এই এলাকার অধিবাসীরা প্রায় সকলেই অতিদরিদ্র এবং তাদের জীবনযাত্রা নির্ভর করে সাময়িক কৃষি ও মাছ ধরার বৃত্তির উপর। বছরের কোনো কোনো সময় যেমন- চিংড়িরেণু ছাড়ার সময় এই অঞ্চলের প্রায় সকল শিশু তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে চিংড়িপোনা ধরার কাজে নিয়োজিত হয়। সুতরাং তখন তাদের কেউই আর বিদ্যালয়ে যায় না। তাছাড়া বর্ষাকালে ইলিশ ধরার মৌসুমে পরিবারের বড় ছেলেরা বাবার সঙ্গে নদীতে মাছ ধরার জন্য বেরিয়ে পড়ে এবং কয়েকদিন পর্যন্ত নদীতে থেকে মাছ ধরে বাড়ি ফিরে আসে। এই সময় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে

তাদের লেখাপড়ায় ছেদ পড়ে। এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যে সব অসুবিধা পরিলক্ষিত হয় তা হলো:

১. এই এলাকার মানুষ অত্যন্ত দরিদ্র এবং জীবন ও জীবিকার জন্য পানির উপর নির্ভরশীল। এলাকার জোয়ার-ভাটা শিশুদের শিক্ষাজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ, জোয়ারের সময় পথঘাট ও স্কুল ঘর পানিতে ডুবে যায়। ফলে শিশুরা তখন স্কুলে আসতে পারে না।

২. চিংড়ির পোনা ও ইলিশ মাছ ধরার মৌসুমে প্রায় সকল শিশুই এই কাজে নিয়োজিত থাকে। ফলে তখন তারা স্কুলে আসতে পারে না।

৩. সরকারের নিয়মের মধ্যে না পড়লেও এই সময় শিক্ষকরা স্কুল বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। ফলে শিশুদের লেখাপড়ার ক্ষতি হয়।

ফসল সংগ্রহ মৌসুমে ব্যস্ত এলাকা

ফসল সংগ্রহ মৌসুমে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশের কর্মক্ষম সকলেই সকল কাজকর্ম ফেলে মাঠে মাঠে গিয়ে ফসল কাটায় অংশগ্রহণ করে। ফসল কাটার মৌসুমের সঙ্গে সরকারের শিক্ষা কার্যক্রমের কোনো যোগসূত্র নেই। বছরের কোনো কোনো মাস যেমন, ফাল্গুন-চৈত্র বা আশ্বিন-কার্তিক মাসে যখন মাঠে মাঠে ফসল পাকতে থাকে তখন বড়দের সঙ্গে সঙ্গে ছোটরাও স্কুল ফেলে মাঠে গিয়ে ফসল সংগ্রহের কাজে লেগে যায়। এই সময় স্কুলের কোনো ছুটি না থাকার ফলে শিক্ষা কার্যক্রম থেকে কিছু সময় ঝরে যায়। ফসল কাটা ছাড়াও বীজ বপন বা নিড়ানির সময়ও বেশ কিছু সংখ্যক শিশু বা শিক্ষকও মাঠের কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়েন। এসব কাজ স্থানীয় এলাকাবাসীদের জীবনযাপন ও জীবিকার সঙ্গে এতটাই ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, তারা এই কাজ বাদ দিতে পারে না। এই সময় প্রধানত যে অসুবিধাগুলো সৃষ্টি হয় তা হলো:

১. ফসল বোনা, নিড়ানি ও ফসল কাটার সময় বাবা-মাসহ সকলেই মাঠে গিয়ে কাজে নিয়োজিত হয়। ফলে শিশুরাও তাদের সঙ্গে মাঠে চলে যায়।

২. ফসল কাটার মৌসুমে এলাকায় শ্রমিকের অভাব ঘটে। ফলে বড়দের পাশাপাশি ছোটরাও ফসল কাটার কাজে নিয়োজিত হয়।

৩. বাড়িঘরে স্থানাভাব থাকলে অনেক সময় স্কুলের মাঠেও ফসল সংরক্ষণ করা হয়। ফলে স্কুলের কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

৪. এই সময় স্কুল খোলা থাকলেও শিক্ষার্থীর উপস্থিতির অভাবে শিক্ষকগণ পাঠদান কাজে মনোবিবেশ করতে পারেন না।

ঈদ ও পূজা-পার্বণ মৌসুমে ব্যস্ত এলাকা

বারো মাসে তেরো পার্বণ বলে বাংলাদেশে একটা কথা আছে। গ্রামে-গঞ্জে হিন্দু-মুসলমান সবার মাঝেই সারা বছর কোনো না কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। মুসলমানদের রোজার ঈদ ও কোরবানির ঈদ, হিন্দুদের দুর্গাপূজা ও লক্ষীপূজা, বৌদ্ধ সম্প্রাদয়ের বৌদ্ধপূর্ণিমা ও প্রবারণা, খ্রিষ্টানদের বড়দিনকে ঘিরে অনেক আয়োজন থাকে। এ সময় শিশুরা পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যায় এবং নির্ধারিত ছুটির পরও কয়েকদিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। আবার কোনো কোনো মাস, যেমন- বৈশাখ অথবা ফাল্গুনে কোথাও কোথাও দীর্ঘকালব্যাপী মৌসুমী মেলা বসে। সেখানে তখন শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। যেমন, গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলায় কালীমন্দির এলাকায় বৈশাখের পুরো মাস জুড়ে শনি ও মঙ্গলবার চলতে থাকে বৈশাখী মেলা। এই সময় কোনো স্কুলই নিয়মিতভাবে চলতে পারে না। স্কুল সময়ের কার্যক্রম থেকে এই সময় সম্পূর্ণভাবে ঝরে যায়। মেলা বা পার্বণ ছাড়াও বিভিন্ন পূজা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও স্কুলের কার্যক্রম ব্যাহত হয়। আরো একটি স্থানীয় সমস্যা হলো হাটবার। যে এলাকায় স্কুল তার আশেপাশে যদি হাট থাকে, তবে ঐ স্কুলে হাটবারে কোনো ক্লাস সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। তাই স্কুলের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তাই বিভিন্ন পূজা-পার্বণের জন্য বিভিন্ন এলাকায় যে সামাজিক সমস্যা তৈরি করে তা হলো:

১. পূজা-পার্বণ বা হাটবারের দিন শিক্ষক ও অভিভাবক সকলেই ব্যস্ত থাকেন বলে ঐ দিন স্কুল কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

২. ঈদ, দুর্গাপূজাসহ ধর্মীয় বিশেষ দিবসের পর কয়েকদিন পর্যন্ত কিছু শিক্ষার্থী ও কোনো কোনো শিক্ষক বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে।

৩. উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় উদ্যোগে মেলা হলে এলাকায় একটি উৎসবমুখর অবস্থার তৈরি হয়। তাই তখন লেখাপড়ার অনুকূল অবস্থা আর থাকে না।

৪. হাটবার হলে এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থাও অনেকটা ভেঙে পড়ে। তাই শিশুদের ঐ দিন স্কুলে যেতে কষ্ট হয়।

৫. গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলায় বৈশাখ মাসে একটি মেলা হয়, যা প্রতি শনি ও মঙ্গলবার করে চলতে থাকে। এই সময় স্কুলে শিশুদের উপস্থিতি একেবারেই কমে যায়।

সমস্যা মোকাবেলায় নমনীয় বর্ষপঞ্জি

ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কারণে শিক্ষা কার্যক্রমে বিভিন্ন বিরতিতে যে অচলাবস্থা দেখা দেয় তা নিরসনকল্পে কিছু ব্যতিক্রম সিদ্ধান্তের প্রয়োজন রয়েছে। দেশব্যাপী যে নিয়মে স্কুল কার্যক্রম চালিত হয় তা সকল বিদ্যালয়ে একইভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। বিভিন্ন মতবিনিময় সভা এবং ফোকাস দল আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হলো, এলাকা ও এলাকাবাসীর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনার

ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বছরের মধ্যে মোট ৭৫ দিন ছুটি নির্ধারিত আছে এবং বাকি ২৯০ দিন শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এই ৭৫ দিনের মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় উৎসব (ঈদ, পূজা, বৌদ্ধপূর্ণিমা, বড়দিন ইত্যাদি), জাতীয় দিবস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ছুটিসমূহ। তাছাড়াও আরো তিন দিন রয়েছে নির্বাহী আদেশে ছুটি, যা প্রধান শিক্ষক প্রয়োজনে শিক্ষা কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতিক্রমে প্রয়োগ করতে পারেন। এই ছুটির তালিকা দেশব্যাপী একই নীতিতে অনুসরণ করা হয় বলে সমস্যাগ্রস্ত এলাকায় বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে তা বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে। এলাকাবাসীর প্রয়োজনানুযায়ী যখন স্কুল ছুটি থাকা উচিত তখন স্কুল খোলা থাকে। আবার যখন তাদের ছুটির প্রয়োজন নেই তখন স্কুল বন্ধ থাকে। এরূপ অবস্থায় দেখা যায় যে, স্কুল খোলা থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে শিশুরা স্কুলে আসতে পারছে না। আবার এমন এমন সময় স্কুল বন্ধ থাকে যখন শিশুরা প্রকৃতই অবকাশ যাপন করে থাকে।

মানসম্মত শিক্ষার একটি নির্ণায়ক হলো ছাত্র-শিক্ষকের সংযোগ সময় (Contact Hour) এবং উপস্থিতির হার বৃদ্ধি। এসব নির্ণায়ক বিবেচনায় রেখে বিদ্যালয়ে ছুটির তালিকা প্রস্তুত করা হয়, যাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা বছরে ৭০০ থেকে ১,২০০ ঘণ্টা পর্যন্ত শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সান্নিধ্যে থাকতে পারে। কিন্তু কোনো কারণে যদি এই সময় কমে যায় তবে তার পরিণতি শিক্ষার মানের উপর গিয়ে পড়বে। দেশব্যাপী শিক্ষার সংযোগ সময় (Contact Hour) যদি স্থির রাখতে হয় তবে ছুটির তালিকাটি সর্বত্র সমচারিত্রিকভাবে প্রয়োগ করা যাবে না। যেহেতু দেশব্যাপী সর্বত্র ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থা এক নয়, তাই বিদ্যালয়ের ছুটি ভোগের বিষয়টিও স্থানীয়ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষা কর্মকর্তাবৃন্দ সবাই এ বিষয়ে একমত যে, এই ছুটি এলাকার প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। তবে এই ছুটি জেলা, উপজেলা বা ইউনিয়নভিত্তিক হবে কি না তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো আলোচক বিশেষ করে শিক্ষা কর্মকর্তাগণ মনে করেন যে, ছুটির তালিকায় সর্বজনীনতা না থাকলে তাদের পক্ষে ঝটিকা পরিদর্শন সম্ভব হবে না। তাই এই ভিন্নতা যদি ব্যাপক হয় অর্থাৎ ইউনিয়নভিত্তিক হয় তবে তাদের পক্ষে কার্যক্রম পরিচালনা বা দায়িত্ব পালন কঠিন হয়ে পড়বে।

শিক্ষা কার্যক্রমে নমনীয়তা অনুসরণ করতে গেলে সবার আগে যে বিষয়টি প্রযোজ্য তা হলো শিক্ষাব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা। অর্থাৎ স্কুলের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পুরোপুরিভাবে স্থানীয় প্রশাসন ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির হাতে ছেড়ে দিতে হবে। শিক্ষা প্রশাসনকে একটি নীতিমালার আওতায় এনে তা বিকেন্দ্রীকরণ করলে এলাকাভিত্তিক যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তার অনেকটাই নিরসন করা যেতে পারে। এলাকার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সমস্যা এলাকার সংশ্লিষ্ট অংশীজনরাই ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেন। তাই এই ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি যদি যৌথভাবে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তবে স্কুলের শিক্ষার মান অপেক্ষাকৃতভাবে কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে মতামতের কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন- জেলা প্রশাসন মনে করে, জেলা বা উপজেলা শিক্ষা কমিটির মতামতের ভিত্তিতে সমগ্র জেলা বা উপজেলায় একই নিয়মের পরিবর্তে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এলাকার

বিদ্যালয়ে নমনীয় বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করা যেতে পারে। কারণ, স্থানীয় জনগণ ও অভিভাবকগণ জীবন-জীবিকা এবং শিশুদের শিক্ষা দুটোই চায়। জেলা ও উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন মনে করে, এই ধরনের স্বাধীনতা শিক্ষকদের মধ্যে দুর্নীতির বিস্তার ঘটাবে। কিন্তু গবেষক দল মনে করেন যে, প্রশাসনে স্বচ্ছতা থাকলে ক্রমে এই দুর্নীতিপ্রবণতা কমে আসবে এবং পরিণামে শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য তা হবে কল্যাণকর।

সুপারিশমালা

সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে যে সকল বিদ্যালয় রয়েছে সেগুলো পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বা এলাকাভিত্তিক নীতিমালা গ্রহণ করা যেতে পারে, যাতে স্কুলের স্থানীয় সমস্যার সঙ্গে বার্ষিক ছুটির একটা সমন্বয় করা যায়। এই ছুটির সংগতিবিধান করতে গিয়ে তা যেন সারা বছরের মোট ছুটির পরিমাণ অতিক্রম করে না যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২. নমনীয় ছুটির তালিকা প্রস্তুত করার জন্য জেলা বা উপজেলার কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি বর্ষপঞ্জি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা যেতে পারে। যাতে তারা স্থানীয় শিক্ষকদের সহায়তায় বর্তমান ছুটির তালিকা পুনর্বিন্যাস করে তা বাস্তবায়ন করতে পারেন।

৩. দেশের নিম্নাঞ্চল ও নদীভাঙন এলাকায় অন্য সময়ের ছুটি বাতিল করে বর্ষা মৌসুমের সময় স্কুল বন্ধ রাখা যেতে পারে, যাতে শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক সংযোগ সময়ের হিসেবে কোনো ঘাটতি না হয়।

৪. উপকূলীয় অঞ্চলে যেখানে জোয়ারের সময় পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে পথ-ঘাট ডুবে যায় কেবল সে এলাকায় অবস্থিত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নমনীয় বর্ষপঞ্জি অবলম্বন করা যেতে পারে। অবশ্যই শিক্ষা অফিসারের জ্ঞাতসারে এসব পরিবর্তন হতে হবে, যাতে তিনি যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করতে পারেন।

৫. ফসল কাটার মৌসুম সারা বাংলায় একটি উল্লেখযোগ্য সময়। এই সময় স্কুল খোলা থাকলেও অনেক শিশু স্কুলে আসে না। তাই ফসল কাটার সময় স্কুল বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. দেশের যে অঞ্চলে ইলিশ মাছ বা চিংড়ির পোনা ধরার জনগোষ্ঠী রয়েছে সেসব এলাকায় মাছ ধরার মৌসুমের সঙ্গে বর্ষপঞ্জি সমন্বয় করে বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৭. হাওর এলাকায় দীর্ঘ সময় চারদিকে পানি বিরাজ করে। ঐ সময় শিশুরা নৌকা করে স্কুলে যেতে ভয় পায়। তাই ভরা বর্ষার সময় যাতে স্কুল খোলা না থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গ্রীষ্ম ও শীতকালীন ছুটির পরিবর্তে বর্ষা মৌসুমে ছুটি দেওয়া হলে মোট স্কুল

কার্যক্রমের উপর তার বিরূপ প্রভাব কমবে। এছাড়াও ওয়াটার বাস বা ভ্রাম্যমান নৌকা বিদ্যালয়ের মতো বিকল্প পন্থা অবলম্বন করে সংযোগ সময় বাড়ানো যেতে পারে।

৮. কোনো অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো আপদকালীন কোনো অবস্থার সৃষ্টি হলে ঐ সময় ছুটির তালিকায় পরিবর্তন আনা যেতে পারে, যা পরবর্তী কোনো সময় স্বাভাবিক ছুটির সঙ্গে সমন্বয় করে নেওয়া যায়।

৯. ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব পালনের জন্য কিংবা হাট-বাজার যখন স্কুলের কার্যক্রম ব্যাহত করে তখন ঐ এলাকায় ছুটির তালিকা পুনর্বিন্যাস করা যায়। এতে শিক্ষার্থীদের মোট সংযোগ সময়ের ক্ষেত্রে কোনো বিঘ্ন ঘটবে না।

১০. রোজা বা পূজার সময় যখন দীর্ঘ ছুটি থাকে তখন ছুটির তালিকায় পরিবর্তন আনা যায়। যেমন- রোজার শেষে ঈদের ঠিক পূর্ব দিন থেকে ঈদের পর কয়েকদিন পর্যন্ত এই ছুটি বর্ধিত করা যায়। ফলে যারা ছুটিতে বাড়ি যায় বা বেড়াতে যায় তাদের অনুপস্থিতির হার কমে যাবে।

পরিশিষ্ট-১

বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে সরকারি/রেজিস্টার্ড বেসরকারি ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছুটির তালিকাসহ বর্ষপঞ্জি ২০১৩

ক্রম	পর্বের নাম	তারিখ	বার	দিনের সংখ্যা
১	আখেরী চাহা সোম্বা	৯ জানুয়ারি	বুধবার	০১ দিন
২	* ঈদ-ই মিলাদুন্নবী	২৫ জানুয়ারি	শুক্রবার	০০ দিন
৩	শ্রী শ্রী স্বরস্বতী পূজা (পঞ্চমী)	১৫ ফেব্রুয়ারি	শুক্রবার	০০ দিন
৪	শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	২১ ফেব্রুয়ারি	বৃহস্পতিবার	০১ দিন
৫	ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম	২২ ফেব্রুয়ারি	শুক্রবার	০০ দিন
৬	মাঘী পূর্ণিমা	২৫ ফেব্রুয়ারি	সোমবার	০১ দিন
৭	শ্রী শ্রী শিবরাত্রি ব্রত	১০ মার্চ	রবিবার	০১ দিন
৮	জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান-এর জন্মদিন	১৭ মার্চ	রবিবার	০১ দিন
৯	স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস	২৬ মার্চ	মঙ্গলবার	০১ দিন
১০	শুভ দোলযাত্রা	২৭ মার্চ	বুধবার	০১ দিন
১১	ইস্টার সানডে	৩১ মার্চ	রবিবার	০১ দিন
১২	চৈত্র সংক্রান্তি	১৩ এপ্রিল	শনিবার	০১ দিন
১৩	বাংলা নববর্ষ	১৪ এপ্রিল	রবিবার	০১ দিন
১৪	মহান মে দিবস	১ মে	বুধবার	০১ দিন
১৫	গ্রীষ্মকালীন অবকাশ ও বৌদ্ধপূর্ণিমা (বৈশাখী পূর্ণিমা)	১৮ মে- ৩ জুন	শনিবার-সোমবার	১৫ দিন
১৬	* শব-ই-মিরাজ	৭ জুন	শুক্রবার	০০ দিন
১৭	* শব-ই-বরাত	২৫ জুন	মঙ্গলবার	০১ দিন
১৮	পবিত্র রমজান, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, জুমাতুল বিদা, শবে কদর, * ঈদ-উল-ফিতর	২০ জুলাই-১৩ আগস্ট	শনিবার	২১ দিন

ক্রম	পর্বের নাম	তারিখ	বার	দিনের সংখ্যা
১৯	জাতীয় শোক দিবস	১৫ আগস্ট	বৃহস্পতিবার	০১ দিন
২০	শুভ জন্মাষ্টমী	২৮ আগস্ট	বুধবার	০১ দিন
২১	* মধু পূর্ণিমা (ভাদ্র পূর্ণিমা)	১৮ সেপ্টেম্বর	বুধবার	০১ দিন
২২	শুভ মহালয়া	৪ অক্টোবর	শুক্রবার	০১ দিন
২৩	শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা (বিজয়া দশমী), * ঈদ-উল-আযহা, শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পূজা ও * প্রবারণা পূর্ণিমা (আশ্বিনী পূর্ণিমা)	১২-২২ অক্টোবর	শনিবার-মঙ্গলবার	১০ দিন
২৪	শ্রী শ্রী শ্যামা পূজা (কালী পূজা)	২ নভেম্বর	শনিবার	০০ দিন
২৫	* হিজরি নববর্ষ	৫ নভেম্বর	মঙ্গলবার	০১ দিন
২৬	* মহররম (আশুরা)	১৪ নভেম্বর	বৃহস্পতিবার	০১ দিন
২৭	বিজয় দিবস	১৬ ডিসেম্বর	সোমবার	০১ দিন
২৮	শীতকালীন অবকাশ ও যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন (বড়দিন)	১৯-২৬ ডিসেম্বর	বৃহস্পতিবার-বৃহস্পতিবার	৭ দিন
২৯	প্রধান শিক্ষকের হাতে সংরক্ষিত ছুটি	-	-	৩ দিন
			মোট	৭৫ দিন

এসডিসি-এর সহায়তায়
গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক প্রকাশিত।
যোগাযোগ : ৫/১৪, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭
ফোন : ৮১১৫৭৬৯, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২
9 789843 362919